শিশুতীর্থে শিশুরা

শ্যামল চক্রবর্তী



শিশুতীর্থে শিশুরা

শ্যামল চক্রবর্তী

ন্যাশনাল

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি

SHISHUTIRTHE SHISHURA

Shyamal Chakraborty

প্রথম প্রকাশ : জুলাই, ১৯৮৬

প্রকাশক
সলিল কুমার গাঙ্গুলি
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড
১২ বঙ্কিম চাটার্জী ষ্ট্রীট
কলকাতা ৭০০০৭৩

মুদ্রক
হারাধন ঘোষ
বীনাপাণি প্রেস
২, ঈশ্বর মিল বাই লেন।
কলকাতা ৭০০০০৬

প্রচ্ছদ
শ্রীগণেশ বসু

দাম : ছয় টাকা

শিশুতীর্থে শিশুরা

ভূমিকা

চিকিৎসার জন্য যেতে হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নে। ছিলাম কৃষ্ণসাগরের তীরে একটি স্যানাটরিয়ামে। ইয়ালটার কাছাকাছি।

ওখান থেকেই দেখতে গিয়েছিলাম আর্টেক পাইওনিয়ার শিবির। সোভিয়েতের তো বটেই আর্টেক পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পাইওনিয়ার শিবির। এই শিবিরের বিশাল কর্মযজ্ঞ, এখানকার গর্বিত শিশুদের সঙ্গে কথাবার্তা আমাকে মুগ্ধ ও অভিভূত করেছিল। রাশিয়ায় শিশুরাই হলো সব থেকে প্রিভিলেজ্ড্—এ সত্য অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করলাম। মনে হলো এই হলো সত্যকার তীর্থ—শিশুতীর্থ—জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।

রোগশয্যায় শুয়েই লিখে ফেললাম রাশিয়ার শিশুদের কথা। গণশক্তিতে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। কমরেড কনক মুখার্জী, বিমান বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, অনিল বিশ্বাস প্রমুখ পার্টি নেতাদের আগ্রহে আমাকে গণশক্তিতে লিখতে হয়েছিল। তারপর ন্যাশনাল বুক এজেন্সির উদ্যোগে লেখাগুলি এটি পুস্তিকাকারে রূপ পেল।

এন. বি. এর কর্মীরা যত্ন সহকারে বইটি মুদ্রণের ব্যবস্থা করেছেন। আমার তাঁরা সহকর্মী, তাই তাঁদের ধন্যবাদ দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।

আমাদের রাজ্যের শিশু ও কিশোরদের বইটি ভাল লাগলে খুশী হব।

শ্যামল চক্রবর্তী

২৫শে জুন, ১৯৮৬

বুয়া (উষসী) কে



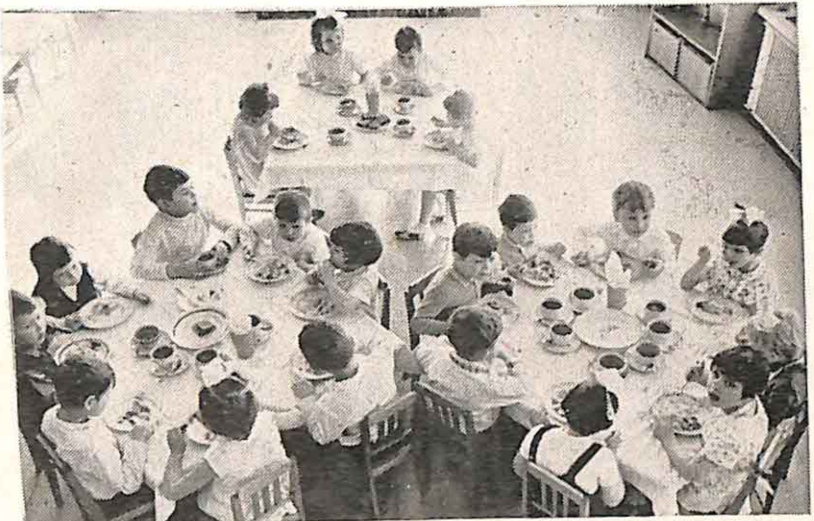
প্রতিটি পার্কই এক একটি শিশুতীর্থ



য়াকুত রিপাব্লিকের টিক্সিতে একটি শিশু চিকিৎসাকেন্দ্র



একটি কিন্ডারগার্টেন স্কুল



লেনিনগ্রাডের একটি কিন্ডারগার্টেন

যাত্রা হলো শুরু

"ঐ যে ভাল্লুকটা দেখছ? কেমন হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে জল খাচ্ছে?" একটা সিগারেট এগিয়ে দিতে দিতে গানাজি আমায় দেখাল। বুলগেরিয়ান সিগারেট। সিগারেটের ব্যাপারে দেখলাম এরা একটু বিদেশ-ভক্ত। যাদের আয় অপেক্ষাকৃত বেশি এবং ব্যয় কম তাদের অনেককেই দেখেছি বিদেশী সিগারেট খেতে। অবশ্য তারা যদি ধূমপায়ী হয়। রাশিয়ান সিগারেটের গুণগত মান ভাল নয়। আমি অনেককেই ঠাট্টা করে বলেছি, আমরা তোমাদের থেকে অনেক বিষয়ে পিছিয়ে আছি, কিন্তু সিগারেটে এগিয়ে।

কথা হচ্ছিল গানাজির সঙ্গে আর্টেকের পাইওনিয়ার ক্যাম্পে। গানাজি সেখারভ। আন্তর্জাতিক পর্যটন দপ্তরের (ইনট্যুরিস্ট-এর) অধীনে ক্রিমিয়ার ইয়লটা অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত অফিসার। এই মুহূর্তে আমার দোভাষী।

আমরা দাঁড়িয়েছিলাম সাগরের ঠিক গায়ে গা লাগিয়ে মাথাতোলা পাহাড়ের একটা ছোট্ট টিলার উপরে। খানিকটা অঞ্চল জুড়ে সামান্য উঁচু-নিচু সমতল ভূমি। কয়েকফুট নিচে ছোট ছোট ঢেউ নিয়ে কৃষ্ণসাগরের নীল জলরাশি আছড়ে পড়ছে টিলার গায়ে। সাপের ছোবলের মতো ঢেউগুলোর মাথায় সাদা ফেনা পাথরের গায়ে লেগে আবার পিছলে যাচ্ছে সাগরের কোলে। পাইন, ম্যাগনোলিয়া, ওক,

উইলো, সাইপ্রাস, বার্চ আর অসংখ্য নাম নাজানা গাছের পাতার সঙ্গে সাগরের হাওয়ার দাপাদাপি মাতামাতি চলছে।

একটু আগেই দেখে এসেছিলাম পুশকিন পাহাড় আর স্মৃতিস্তম্ভ। রাশিয়ার বিখ্যাত কবি পুশকিনের বড় প্রিয় ছিল আর্টেক। এর দিগন্ত জোড়া মোহময়ী রূপ পুশকিনকে টেনে নিয়ে আসতো সৌন্দর্যের এই বেলাভূমিতে। এইখানে মার্বেল পাথরে সোনালী অক্ষরে খোদাই করা আছে পুশকিনের কবিতার কয়েকটি লাইন। জনশ্রুতি ১৮২০ সালে পুশকিন ক্রিমিয়া ছেড়ে চলে যাবার আগে ক্রিমিয়াকে বিদায় জানিয়ে কবিতাটি রচনা করেন। গানাজি আমাকে কবিতাটি অনুবাদ করে ইংরেজি অর্থ বলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে বিনীতভাবে জানাল যে সব কথা তার পক্ষে ইংরেজিতে অনুবাদ করা সম্ভব নয়। তবে মর্মার্থ আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি। ওর ইংরেজি ভাবানুবাদ আমার বাংলায় যা দাঁড়াল ঃ

বিদায় বন্ধু মুক্ত প্রকৃতি তুমি।
উর্মিমুখর সাগরের তীরে
নীল জলরাশি নেচে যায় ফিরে,
অরণ্য ঘেরা পাহাড়ের গায়
চাঁদের কিরণ দোল খেয়ে যায়
আজ তরঙ্গ ভেঙে বিদায় জানাও
আমার চরণ চুমি।
বিদায় বন্ধু মুক্ত প্রকৃতি তুমি।

প্রিভিলেজ্‌ড ক্লাস

গানাজি লাইটার জ্বালিয়ে মুখের কাছে ধরল। ভাল্লুকটা একটু দূরে। আমার সামনেই একটা মনুমেন্ট—তার পিছনে সাদা দেওয়ালে কালো রঙের ছোঁয়ায় পেশীবহুল প্রমিথিউস। শিকল ছিঁড়ছে কিন্তু মনুমেন্টটা কী জন্য।

গানাজি জানাল, আর্টেক পাইওনিয়ার ক্যাম্প হলো প্রধানত আন্তর্জাতিক ক্যাম্প। পৃথিবীর ৮৩টি দেশের মাটি দিয়ে এই মনুমেন্ট তৈরি হয়েছে। এই মনুমেন্ট হলো জাতিতে জাতিতে সৌভ্রাতৃত্ব ও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ছেলেমেয়েদের বন্ধুত্বের প্রতীক। সোভিয়েতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শ্রেষ্ঠ পাইওনিয়াররাও যেমন এই ক্যাম্পে আসে, তেমন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পাইওনিয়ার সংগঠনের কিশোরদের আমন্ত্রণ জানানো হয় গ্রীষ্মকালে।

রাশিয়ার গ্রীষ্মকাল মানে জুন-জুলাই-আগস্ট মাস। এই সময় এদের স্কুলের ছুটি। স্কুল খুলবে আবার ১লা সেপ্টেম্বর। যখন এসেছে শরৎ, হিমের পরশ লেগেছে হাওয়ার পরে। গাছের পাতাগুলোর ঝরে যাওয়ার সময় শুরু হওয়ার সংবাদ পেয়ে বুক দুরু-দুরু করছে। সূর্যদেবের বিশ্রাম নেবার সময় ক্রমশ বাড়তে শুরু করছে। এমন সময় লাল, নীল, সবুজ—রঙবেরঙের গরম পোশাক আলমারি থেকে বার করে পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঢেকে ছোট ছোট কচি কচি মুখ ছোট ছোট চুনি আর পান্না বাঁধভাঙা আলোর হাসি ছড়াতে ছড়াতে ছোট্ট ছোট্ট

পায়ে স্কুলে যেতে শুরু করে। কিন্তু গরমের সময় মেঘের কোলে রোদ ওঠে আর ওদেরও ছুটি শুরু হয়।

সোভিয়েতে পাইওনিয়ারদের দেখলেই চেনা যায়। দশ থেকে পনেরো বৎসরের মধ্যে বয়স। গলায় লাল স্কার্ফ। প্রতিটি স্কুলেই আছে পাইওনিয়ারদের শাখা। সারা দেশে ছড়ানো আছে হাজার হাজার কিশোর-কিশোরীদের অবসর-বিনোদনকেন্দ্র। পাইওনিয়ার স্কুলছাত্রদের প্রাসাদ অথবা ক্লাব। যোগ্যতাসম্পন্ন সর্বক্ষণের কর্মীদের তত্ত্বাবধানে নানা ধরনের সৃজনশীল কাজে অংশ নেয়। বিজ্ঞান কারিগরি, সাহিত্য, কলাচর্চা, খেলাধুলা, পড়াশুনা, বিখ্যাত ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার। সারা রাশিয়াতে আছে ষাট হাজার পাইওনিয়ার ক্যাম্প। এগুলিকে স্বাস্থ্যকেন্দ্র, আমোদপ্রমোদ, বিশ্রামের জায়গা বলা হয়। রাশিয়াতে প্রতি বৎসর এক কোটি কুড়ি লক্ষ স্কুলছাত্র আর কিশোর-কিশোরী ক্যাম্পগুলোতে ছুটি কাটাতে আসে। সোভিয়েত সরকার আর ট্রেড ইউনিয়ন সব খরচা বহন করে যাচ্ছে।

শিশুরাই হলো রাশিয়াতে সবচেয়ে 'প্রিভিলেজ্ড ক্লাস'। কথাটা অনেকদিন ধরেই শুনে আসছিলাম। মস্কোতে এসেও কয়েকজনের কাছে শুনলাম। আজ স্যানাটরিয়াম থেকে গাড়িতে আসার সময় গানাজি হাসতে হাসতে আমাকে প্রশ্ন করেছিল—বলতে পার সোভিয়েতে কোনও 'প্রিভিলেজ্ড ক্লাস' আছে কিনা। আমিও হাসতে হাসতে জবাব দিয়েছিলাম "জানি। আছে। শিশুরাই হলো সবচেয়ে প্রিভিলেজ্ড ক্লাস।" কথাটা কিন্তু শুধু প্রচার নয়। আপনি রাশিয়াতে যেখানেই যাবেন, দেখবেন গোটা রাশিয়াই যেন লেনিনের কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি "সবচেয়ে ভাল জিনিসগুলি শিশুদের জন্য"—এটাই

বোধহয় সোভিয়েত জীবনের আইন। আনন্দের সঙ্গে সেই আইন সকলেই প্রয়োগ করছে।

একদিন স্যানাটরিয়ামে শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত দুজন ভদ্রমহিলার (দুইজনেই রোগিণী) সঙ্গে কথা হচ্ছিল। একজন প্রাথমিক শিক্ষিকা আর একজন মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা। তাদের কাছে প্রশ্ন করেছিলাম "আচ্ছা এই যে শিশুদের এতো আদর দেওয়া হয়, এতে শিশুদের নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে না?" দুজনের কাছে পৃথক পৃথক সময়ে প্রশ্ন করেছিলাম। একই জবাব পেলাম।

"আশঙ্কা তো থেকেই যায়। তাই আমরা ভালবাসার সঙ্গে শেখাচ্ছি কর্তব্যবোধ। এই যে আপনি আর্টেক ক্যাম্পে যাবেন, দেখবেন, কিশোরদের কেন্দ্রীয় নির্দেশ হলো "সব জিনিসই নিজে কর— মাসিমা বা দিদিমার জন্য অপেক্ষা করো না"। প্রথম দিনের সমাবেশেই ওদের বলে দেওয়া হয়, তাদের কী কী কাজ নিজেকে করতে হবে। ঘরটা সবসময় পরিষ্কার তকতকে রাখতে হবে। জুতো ঝকঝকে করবে, জামাকাপড় নিজেদের ইস্ত্রি করতে হবে। বাড়ি পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। পাইওনিয়ারদের কয়েকটা গ্রুপে ভাগ করা হয়। তারা তাদের মনিটর নির্বাচিত করে। প্রত্যেক গ্রুপকে মাঠ, রাস্তা, ফুলের বাগান, বিচ্-এর অংশ ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়। সেখানে কোথাও যেন একবিন্দু ময়লা, গাছের ঝরা পাতা, কোনও কিছুই পড়ে না থাকে। মনিটরদের কাজ হলো, তার নিজের গ্রুপের সদস্যরা ঠিকমতো কাজ করছে কিনা তা দেখা। বিছানা নিখুঁত, পরিপাটি করে বিছানো কিনা।

বিছানা পরিপাটি করে বিছিয়ে রাখা এদের একটা দুর্লভ আর্ট। যা এতদিন ধরেও আমি আয়ত্ত করতে পারলাম না। অতগুলো

তোষক, কম্বল ভাঁজের কায়দা, একগাদা চাদর আর বিশালাকৃতি নরম বালিশ বর্গক্ষেত্রের মতো চারিদিক সমান করে সাজানো—এরা বোধহয় অভিমন্যুর মতো জন্মের আগে থেকেই শিখে আসে। আমি তো রোজই ভাবি, আজ আমার বিছানা সাজানো বোধহয় খুবই ভাল হয়েছে। কিন্তু তারপর কোনও এক সময় ঘরে ফিরে এসে দেখি কোনও মমতাময়ীর হাতের স্পর্শে আমার ঘরের শ্রী ফিরে গিয়েছে। সংস্কৃতির পার্থক্যের এই হীনমন্যতায় রোজই আমাকে ভুগতে হয়। আর সৌন্দর্যবোধ। প্রত্যেক পাইওনিয়ারের ঘরের টেবিলে আর খাবার টেবিলে ফুলদানি। কয়েকটা পাতার ছোট ডালে অন্তত একটা হলেও তাজা, মৃদু সৌরভ ছড়ানো গাঢ় রঙের জীবন্ত ফুল।

আমার হাতের বুলগেরীয় সিগারেটটা প্রায় শেষ হয়ে আসছিল। শেষ টান দিয়ে কলকাতার অভ্যাসমতো পায়ের তলায় পিষে নিভিয়ে দেওয়া আর ফেলে দেওয়া একসঙ্গেই সারতে যাচ্ছি, এমন সময় ঝকঝকে মেঝের দিকে তাকিয়ে বিবেক মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। সিগারেটটা কোথায় ফেলা যায় চারদিক দেখছি, এমন সময় গানাজিকে দেখলাম সিগারেটটা রাস্তার পাশে বড় একটা ময়লা ফেলার বালতির গায়ে চেপে ধরে নিভিয়ে বালতির মধ্যে ফেলে দিল।

বিভিন্ন জায়গায় দেখেছি কয়েকহাত অন্তর এই ময়লা ফেলার বড় বড় বালতি। বাচ্চা থেকে বড় সকলেরই অভ্যাস ময়লাটা ওখানেই ফেলা।

হে অতীত কথা কও

চলতে চলতে গানাজির প্রশ্নে আবার মুখ ফেরাই, ভাল্লুকটা ওখানে কবে থেকে জল খাচ্ছে জান ?

সব প্রশ্নের কী আর উত্তর দেওয়া যায়। শুধু ওর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলাম। গানাজি ওর ইতিহাস শুরু করল ঃ

ভাল্লুকটাকে প্রথম দেখেন জিনোভি সলভয়েভ। তিনি ছিলেন ১৯২৪-২৫ সাল নাগাদ সোভিয়েতের স্বাস্থ্য দপ্তরের উপমন্ত্রী। তিনি ক্রিমিয়াতে এসেছিলেন প্রথম পাইওনিয়ার ক্যাম্প স্থাপনের একটা স্থান খুঁজে নিতে। ক্রিমিয়া এর চার বৎসর আগেই শ্বেতরক্ষীদের হাত থেকে মুক্ত হয়েছে। এই স্থানটা জারের আমল থেকেই স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য ধনীরা ব্যবহার করছিল। ক্রিমিয়া মুক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গেই ১৯২০ সালের ২১ ডিসেম্বর লেনিন একটি ডিক্রি জারি করলেন, "ক্রিমিয়া ব্যবহৃত হবে শ্রমজীবী জনগণের চিকিৎসার জন্য"। এবার দাঁড়িয়ে গেলাম। বাঁদিকে লেনিনের বিশাল মূর্তি। আর্টেক পাইওনিয়ার ক্যাম্প লেনিনকেই উৎসর্গ করা। একটা পাথরে দেখেছি রাশিয়ান ভাষায় খোদাই করা ক্রিমিয়া ডিক্রির পূর্ণ বয়ান। এটাই হলো প্রাণকেন্দ্র। এখানেই পাইওনিয়ারদের উৎসবের দিন গার্ড অফ অনার হয়। এখান থেকেই শুরু হয় সমাবেশ এবং উৎসব। আর্টেকের সবগুলি ক্যাম্পে যাওয়ার রাস্তা এখান থেকেই শুরু হয়। ক্যাম্পে আসা শিশুরা এখানেই তাদের ক্যাম্প জীবনের প্রথম মুহূর্তগুলি শুরু করে। আবার গানাজির ইতিহাস শুরু হলো ঃ

সলভয়েভ এবং তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রী নিকোলাই সিমাসকো আর্টেককেই বেছে নিলেন পাইওনিয়ার ক্যাম্পের স্থান হিসাবে। জান তো আর্টেক হলো গ্রীক শব্দ। ক্রিমিয়াতে তুমি অনেক দেশের ভাষার শব্দ পাবে। ক্রিমিয়া অনেক বার হাত বদল হয়েছে।

এবার গানাজির অবাক হবার পালা। ওতো আর জানে না,

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাস নিয়ে বি এ পাশ করতে হলে নিজের দেশের ইতিহাস কতটা জান, তা বড় কথা নয়, ইওরোপের ইতিহাস আকণ্ঠ গিলতে হয়। ক্রিমিয়ার যুদ্ধ তো ভি ভি আই — ভেরি ভেরি ইম্পরট্যাণ্ট লিখে রাখতাম। পরীক্ষায় ওটা আসবেই। আর ক্রিমিয়াতে আসতে হবে জেনে ক্রিমিয়ার ইতিহাস ভূগোল মস্কো থেকেই আদ্যোপান্ত পড়ে এসেছিলাম।

কিন্তু এই গুপ্ত রহস্য আর ওর কাছে ফাঁস করি কেন?

আমিই এবার গম্ভীর চালে শুরু করিঃ তোমাদের ক্রিমিয়ার ইতিহাস খুব ঘটনাবহুল, গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডটাসের ইতিহাসে এই ক্রিমিয়ার কথা পাওয়া যাবে। তাঁর মতে খ্রীস্টপূর্ব অষ্টাদশ শতাব্দীতে এটা টাউরস উপজাতিদের বাসভূমি ছিল। তখন থেকে এই উপকূলভূমি টাউরিডা নামে পরিচিত হয়ে আসছে। খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে স্কিথিয়ানস এখানে রাজ্য স্থাপন করে এবং গ্রীকরা এখানে উপকূল জুড়ে বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে তোলে। সিমফার হুল বিমানঘাঁটিতে নেমে ক্রিমিয়ায় আসবার পথে আমি ওদের প্রাচীন নগর স্কিথিয়ান নেথলের ভগ্নস্তূপ দেখে এসেছি। এই নগরটি খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত স্কিথিয়ানদের রাজধানী ছিল। আমি ওদের ভগ্ন প্রাসাদ, প্রাচীর প্রভৃতি দেখে এসেছি। কিন্তু সে কথা এখন নয়।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তাতার মোঙ্গল, পঞ্চদশ শতাব্দীতে তুর্কির অধীনে থাকার পর অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে ১৭৮৩ সালে ক্রিমিয়া রাশিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়। বিপ্লবের পর ১৯১৮ সালের মার্চ মাসে ক্রিমিয়াতে টোরিডা সোভিয়েত সোস্যালিস্ট রিপাবলিক ঘোষিত হয়

কিন্তু আবার ফরাসী, জার্মান এবং ইংরেজ সৈন্যরা ক্রিমিয়া দখল করে। শেষ পর্যন্ত ১৯২০ সালে রেড আর্মি ক্রিমিয়াকে মুক্ত করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ক্রিমিয়া নাৎসি জার্মানির হাতে চলে যায়। ১৯৪৪ সালের এপ্রিল মাসে পার্টিজানদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আবার ক্রিমিয়ায় লাল পতাকা ওড়ে।

একনাগাড়ে ইতিহাস বলে আমি গানাজির দিকে তাকিয়ে একটু তৃপ্তির সঙ্গে হাসি। গানাজি গভীর আগ্রহের সঙ্গে আমার কথা শুনছিল। ওর চোখে মুখে তারিফের ভঙ্গিও আমি লক্ষ্য করলাম। এরপর টিপিক্যাল রাশিয়ানদের মতো আমার পিঠ চাপড়ে বলে উঠল খারাশো, খারাশো, অচিন খারাশো (ভাল, ভাল, খুব ভাল)।

আমি গদ গদ হয়ে ওকে একটা ফিলটার উইলস্ কিং সাইজ সিগারেট উপহার দিলাম। বাতাস আড়াল করে সিগারেট ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে ও হেসে বলল, ‘‘খারাশো—কিন্তু আর্টেকের কী হলো ?”

“তার মানে ?”

“মানে—আর্টেক কথাটার অর্থ কী, তাতো বললে না।” কী বিপদ! অনেক কষ্টে মই বেয়ে তালগাছের মাথায় উঠে যদি কেউ দেখে, মইটা ধপ করে পড়ে গেল. তখন কী হাল হয় বলুন তো!

এইমাত্র একটা ভাল সিগারেট দিলাম তার বদলে এখন এই প্রতিদান।

কিন্তু গানাজি আমাকে বেশিক্ষণ অপ্রস্তুত রাখল না। নিজেই শুরু করল, “আর্টেক শব্দটা এসেছে ‘আর্টেকাস’ নামে একটা গ্রীক শব্দ থেকে। ‘আর্টেকাস’ কথাটার অর্থ হলো কোয়েল পাখি, গ্রীষ্ম ও শরতে এখানে কোয়েল পাখিরা থাকত। শীতে উড়ে যেত তুর্কিতে,

মধ্যপ্রাচ্যে কৃষ্ণসাগর পার হয়ে, এত কোয়েল পাখি দেখেই বোধহয় গ্রীকরা এই নাম দিয়েছিল।”

পাহাড়ের রূপকথা

“আজকে আর্টেকের পাইওনিয়ার ক্যাম্পের বিশাল চেহারা দেখছ। তখন কিন্তু শুরু হলো মাত্র কয়েকখানা তাঁবু দিয়ে।” গানাজি বলে চলল : “মোট ৮ খানা তাঁবু, চারটে তাঁবুতে ২০ জন করে আর চারটে তাঁবুতে ১০ জন করে থাকার ব্যবস্থা। দুটো ছোট বাড়ি। একটায় রান্নাঘর আর খাবার ঘর আর একটায় ক্লাব, লাইব্রেরি আর ডাক্তারের ঘর। এটা ছিল ১৯২৫ সালের বসন্তকাল।”

এখন একটা উঁচু টিলার উপর থেকে তাকিয়ে আছি। গায়ে গায়ে বেড়ে ওঠা অসংখ্য গাছের ফাঁক দিয়ে গোটা আর্টেক সাম্রাজ্য আমার চোখের সামনে। অ্যারি বারবুসের ভাষায় “আর্টেক হলো সম্রাটবিহীন, সৈন্যহীন একটা বিশাল সাম্রাজ্য”। পাঁচটা বিশাল ক্যাম্প নিয়ে এই আর্টেক সাম্রাজ্য। তাদের নাম সাগর, পাহাড়, বেলাভূমি, আজুর এবং সাইপ্রাস। ‘সাগর ক্যাম্পটি’ উৎসর্গ করা ইতালির কমিউনিস্ট নেতা পামিরো তোগলিয়াত্তির নামে।

‘সাগর ক্যাম্প’ থেকে সাপের মতো এঁকে বেঁকে গাছের ডাল আর পাতার মুকুট পরে রাস্তা উঠে গিয়েছে পাহাড়ে। মনে হচ্ছে, যেন কোনও সবুজ গোলাকার বেষ্টনী স্নিগ্ধ ছায়া ছড়িয়ে চলে অবিশ্রাম অলকার পথে।

‘সাগর ক্যাম্প’ছাড়িয়ে আমার দৃষ্টি চলে যায় আরও সামনে যেখানে

'পাহাড় ক্যাম্প' অতীতের কাঠের কাঠামোর জায়গা নিয়ে। ষাটের দশকে এখানে গড়ে উঠেছে নতুন প্রাসাদ। তিনটি পাঁচতলা বাড়ি। একটির নাম হীরক, ইয়াতারনায়া (অর্থ জানতে পারলাম না) আর একটির নাম স্ফটিক।

হীরক ব্লকের পাইওনিয়ার ব্রিগেডের নাম হয় আর্টেকের প্রতিষ্ঠাতা সলভয়েভের নামে। 'স্ফটিক'-এ অবস্থানকারী ব্রিগেডের নাম প্রথম মহাকাশচারী ইউরি গ্যাগারিনের নামে। অবশিষ্ট ব্লকের ব্রিগেডের নাম দেওয়া হয় বিখ্যাত সোভিয়েত শিশু সাহিত্যিক আকাদি গিয়াতরের নামে। 'পাহাড় ক্যাম্প' পিছনে ফেলে আমার দৃষ্টি এগিয়ে যায়। এবার আমার নজর কেড়ে নেয় 'বেলাভূমি ক্যাম্প'। সব থেকে নতুন কিন্তু সব থেকে বড়। ১৬০০ কিশোর-কিশোরীর হাসি আর গানে বেলাভূমি উচ্ছল হয়ে থাকে। গানাজির কথায় জানলাম বাইশ বছর আগে যখন এই ক্যাম্প শুরু হয় তখন শুধু ছিল নুড়িভরা একটা সমুদ্রতীর আর একটা পাহাড়—যার মাথাজোড়া অতিকায় টাক। আজ সেখানে হাজার হাজার গাছ আর ছোট ছোট সযত্নলালিত ঝোপ। এইখানে চারটি পাইওনিয়ার গ্রুপ থাকে। বিভিন্ন রকমারি সুন্দর প্রকৃতির থেকে বেছে নেওয়া নাম। নদী, হ্রদ, বাগান, অরণ্য। বিভিন্ন ব্লকে ভাগ করা গ্রুপগুলির নামও সুন্দর। ভলগা, আমুর, ইয়াংসি, আংগারা নদীর নামে—লসেন, বৈকাল হ্রদের নামে, আর, ডেইজি ফুল, পাপলার গাছ, জানা না জানা অসংখ্য ফুল আর গাছের নামে।

গানাজি বলল এখান থেকেই সলভয়েভ প্রথম ভাল্লুকটাকে দেখেন। ঠিক আজকের মতো ঐভাবেই জল খাচ্ছিল। সেটা ১৯২৪ সালের কথা। পাইওনিয়ার ক্যাম্পের জন্য তিনি স্থান নির্বাচন করতে

এসেছিলেন। ভাল্লুকটাকে তাঁর ভাল লেগে গেল। সমুদ্র, ভাল্লুক আর পুশকিন পাহাড়ের সীমানাঘেরা এই অঞ্চল তিনি বেছে নেন।

আমার দৃষ্টি তখন আর ভাল্লুকের উপর নেই। সাগরের শরীর ঘেঁষে ঘেঁষে উঁচুনিচু পথের উপর দিয়ে চলে গেছে সোজা—যেখানে বিকেলের ঝিকিমিকি রোদে ঝিলমিল ঢেউয়ের দোলায় আর্টেক স্কোয়াড্রনের জাহাজগুলো নাচের তালে তালে অল্প অল্প দুলছে। তারই সঙ্গে সরলরেখা টেনে নিয়ে ঘন গাছের ওড়নার আড়ালে আবছা অস্পষ্ট যেন ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়. 'আজুর ক্যাম্প।'

মহাকাশচারী ভ্লাদিমির কামোরোভের নামে ক্যাম্পটি উৎসর্গীকৃত। হঠাৎ চোখে পড়ল, একটা ছোট্ট মনুমেণ্টের পাশ দিয়ে কোনো পাইওনিয়র যখনই যাচ্ছে তখনই একটু দাঁড়িয়ে মনুমেণ্টের উদ্দেশ্যে সেলাম জানাচ্ছে।

গানাজির দিকে জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে চাইলাম। গানাজি জানাল, "তোমরা জান যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমাদের দেশে ২ কোটি লোক মারা যায়। এদের নানা স্মৃতিস্তম্ভ নানা জায়গায় স্থাপন করা আছে। এই স্মৃতিস্তম্ভটি হলো যারা ছোটবেলায় আর্টেক ক্যাম্পে এসেছিল, পরে বিশ্বযুদ্ধে দেশরক্ষায় বীরের মৃত্যু বরণ করেছে, তাদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। প্রত্যেকটি পাইওনিয়ার এই স্থানটি অতিক্রম করার সময় বীরদের প্রতি সম্মান জানিয়ে সেলাম জানায়।"

গানাজি এবার আমাকে শেষ ক্যাম্পটি আঙুল দিয়ে দেখাল। 'সাইপ্রাস ক্যাম্প', ক্যাম্পের চারিদিকে শুধুই সাইপ্রাস গাছ। কত হতে পারে সংখ্যায়?

গানাজি জানাল শিশুরা গুনে বলেছে আড়াই হাজারের বেশি। এই ক্যাম্প শুধুই কাঠ দিয়ে তৈরি।

আমি মনে মনে ভাবছিলাম আশি জন কিশোর নিয়ে যে পাইওনিয়ার ক্যাম্পের যাত্রা শুরু, আজ সেখানে ৪,৫০০ কিশোর-কিশোরী একসঙ্গে জীবনের গান গেয়ে মুঠো মুঠো হাসি ছড়িয়ে অন্ধকারকে দুপায়ে মাড়িয়ে মুক্ত প্রাণের সাড়া নিয়ে আসে।

হঠাৎ চমক ভাঙল গানাজির বেরসিক প্রশ্নে। "বলতো ভাল্লুকটা এখানে কতদিন ধরে জল খাচ্ছে ?..."

এবার আমার মনে একটু রাগ হলো। তখন থেকে ওকে ভাল্লুকে পেয়ে বসেছে। না ভাল্লুকের প্রসঙ্গ এবার একবারে শেষ করে দিই। আর যেন প্রসঙ্গ তুলতে না পারে।

একটু রুক্ষভাবেই ওর দিকে একটা মোক্ষম প্রশ্ন ছুঁড়লাম—"তুমি বলতো, পৃথিবীর বয়স ঠিক কত ?"

গানাজি হেসে বলল, "খুব রেগে গিয়েছ, তাই না ?"

আমি পিছু হটলাম না। বললাম : "ঠিক আছে, প্রশ্নটা একটু সহজ করে দিচ্ছি। বলতো পৃথিবী বর্তমান আকৃতি কবে পেয়েছে ?"

গানাজি এবার পাহাড় কাঁপিয়ে হেসে উঠল : "শোন, শোন, আসলে ভাল্লুকটার সঙ্গে পাইওনিয়ারদের একটা আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। দেখছ তো পাহাড়টাকে দেখে মনে হয় ঠিক একটা ভাল্লুক হুমড়ি খেয়ে পড়ে সাগরের জল খাচ্ছে। পাহাড়টার নাম আসলে 'আয়ুদাগ'। কিন্তু পাইওনিয়ারদের মুখে মুখে ওটা এখন ভাল্লুক পাহাড় হয়ে গিয়েছে। এই ভাল্লুক পাহাড় নিয়ে ছেলেমেয়েরা কত গান-কবিতা-গল্প রচনা করেছে। এটার সম্পর্কে নানারকম কিংবদন্তীও ওরা তৈরি করেছে। তার মধ্যে একটা সুন্দর গল্প তোমায় বলি শোন।"

আবার একটা সিগারেট ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে গানাজি পাঁয়তারা কষল। আমি খাতাকলম বার করে বললাম: "শুরু কর তোমার রূপকথা।"

"উঁ-হুঁ-হুঁ আমার নয়, আমার নয়, আর্টেক শিশুদের তৈরি রূপকথা।"

"অনেক অনেক দিন আগে এক যে ছিল……"ততক্ষণে আমার খাতায় আমি লিখে ফেলেছি—এক যে ছিল রাজা।

গানাজি মুখ বাড়িয়ে দেখল, আমি লিখেছি "কিং"। ও হেসে বলল, "না না, রাজা-রাণী নয়"।

"তাহলে এক যে ছিল ভাল্লুক"।

"উঁহু হলো না, হলো না। এক যে ছিল মেয়ে। খুব সুন্দর দেখতে। মেয়েটা একা থাকত আর পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াত। এর মধ্যে তার ভাব হয়ে গেল এক ভাল্লুক পরিবারের সঙ্গে। ভাল্লুকবাবা, ভাল্লুক মা, ভাল্লুক ছেলেমেয়ে সবার সঙ্গে তার খুব ভাব। সবাই মেয়েটাকে খুব ভালবাসে। লক্ষ্য রাখে যেন কোন বিপদ-আপদে না পড়ে। তাকে ফল পেড়ে দেয়, মাংস খাওয়ায়।

"এরমধ্যে হলো কী একদিন হঠাৎ একটা···"

আমি কথা জুগিয়ে দিলাম, "রাক্ষস"

"না—না—রাক্ষস খোক্ষস নয়, একটা সুন্দর ছেলে সূর্যের আলো বেয়ে পাহাড়ে নামল। তারপর মেয়েটার দিকে যখন চোখ পড়ল আর পলক পড়ে না। বলল, 'কন্যা, আমি তোমায় বিয়ে করব'। মেয়েটা এদিক ওদিক চেয়ে দেখল ভাল্লুক-পরিবার বাড়ি নেই—খাবারের যোগাড়ে বেরিয়েছে। সে ছেলেটার হাত ধরে ফিক করে হেসে বলল, 'তাহলে চল, তাড়াতাড়ি কেটে পড়ি'।

"তারপর দুজনে হাত ধরাধরি করে সমুদ্রের তীরে গেল। একটা নৌকা বেয়ে চলল সূর্যের দিকে।

"এদিকে ভাল্লুক-পরিবার যখন ফিরল তখন দেখে মেয়েটা কোথাও নেই। খোঁজ খোঁজ খোঁজ। সবচেয়ে বড় ভাল্লুকটা একটা পাহাড়ের চূড়ায় উঠে দেখতে পেল নৌকাটা। ঢেউ ভেঙে ভেঙে চলেছে। সে ছুটে এল সমুদ্রতীরে। কিন্তু কেমন করে নৌকা ধরবে? ভাল্লুকটা সিদ্ধান্ত নিল, সে সমুদ্রের জল শুষে খেয়ে নেবে। তাহলে মাটিতে নৌকা আটকে যাবে।"

শিশুরা প্রথম দিন আর্টেকে এসে প্রথম দেখতে যায় তাদের কিংবদন্তীর ভাল্লুক পাহাড়। ভাল্লুকটা আজও হুমড়ি খেয়ে পড়ে কৃষ্ণ সাগরের জল খেয়ে চলেছে।

হাসির কলরোলে নতুন জীবন গড়ার ডাক

আজ সমুদ্রতীর উজ্জ্বল পতাকায় সাজানো। ঝকঝকে সুন্দর একটি দিন। দিগন্তজোড়া নীল আকাশে রাজহাঁসের মতো দুই-এক টুকরো সাদা মেঘ আকাশের কিনারা খুঁজতে বেরিয়ে পড়েছে। সমুদ্র আজ খুবই শান্ত। যতদূর চোখে পড়ে ছোট ছোট ঢেউয়ের মাথায় চিকচিক করে উঠছে ইস্পাতের ছুরির মতো সাদা সাদা ফলা। ফলাগুলি বুদবুদের মতো দেখা দিয়েই মিলিয়ে যাচ্ছে। বাতাসের বেগ আজ কম। সাইপ্রাস আর পাইন গাছের পাতায় মৃদু বাতাসের ছোঁয়ায় অস্পষ্ট মর্মর ধ্বনি। নীরবতা ভঙ্গ না হয়, এমন করে যেন ফিসফিস করে গা এলিয়ে কথা

বলছে গাছগাছালি। ঢেউয়ের মাথায় বসে দোল খেয়ে নিচ্ছে সীগাল পাখিরা।

সাগরের তীর আজ ভেঙে পড়েছে কয়েক হাজার শিশুর কলকাকলিতে। পতাকা নিয়ে তারা অভ্যর্থনা জানাতে এসেছে। দেশবিদেশের শিশুরা হাতে হাত দিয়ে সাদর সম্ভাষণের জন্য তৈরি।

আজ আসবেন নেপচুন। নেপচুন সমুদ্রের দেবতা। জুলাই-এর এমনই একটি শান্ত দিনে অতল সমুদ্র থেকে উঠে আসেন তিনি। শিশুর আর কিশোরদের সামনে এসে দাঁড়ান। তাই শিশুরাও তৈরি অধীর প্রতীক্ষা নিয়ে। কিন্তু দেবতা কোন্ ভাষায় কথা বলবেন? ভারতের দেবতারা তো সংস্কৃত ভাষায় কথা বলেন। কিন্তু রাশিয়ার দেবতারা? বিভিন্ন দেশের শিশুরা জেনে গেল, নেপচুন কথা বলবেন পারুস্কিতে, মানে রুশ ভাষায়। তাই প্রতিটি দেশের শিশুদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে একজন করে দোভাষী। সমুদ্রদেবতার কথা নিজের নিজের ভাষায় অনুবাদ করে দেওয়ার জন্য।

হঠাৎ হৈচৈ শুরু হলো। আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল ছেলেমেয়ের দল। এসেছে—এসেছে—ঐ তো—আসছেন—তিনি আসছেন।

সমুদ্রের জল তোলপাড় হতে লাগল তীর থেকে প্রায় সিকি মাইল দূরে। ডানা ঝাপটে উড়ে গেল ভীত চকিত সীগালের ঝাঁক। তুবড়ির মতো ঠেলে উঠল জলের ফোয়ারা। মুহূর্তে মুহূর্তে ফোয়ারার রঙ বদলালো—লাল, নীল, সবুজ, হলুদ।

ফোয়ারার আবরণের মধ্য দিয়ে দেখা গেল একটি রকেটের মুখ—কয়েক মুহূর্তের মধ্যে দেবতার সেই আধুনিক জলযান আবার জলের

গভীরে অদৃশ্য হয়ে গেল। শুধু দেখা গেল ঢেউ ভেঙে তীরের দিকে আসছে একটি মোটর বোট।

হাজার হাজার রুমাল—রঙ-বেরঙের—সমুদ্রতীরে উড়তে লাগল। হাততালি আর বাজনার শব্দে সমস্ত নীরবতা খান খান হয়ে ভেঙে গেল। মোটর বোট এবার সমুদ্রতীরে এসে লেগেছে। দেবতারাও এখন আধুনিক। নেপচুন বোট ছেড়ে তীরে নামলেন।

সমুদ্র-দেবতার দীর্ঘ সাদা দাড়ি হাঁটু ছাড়িয়ে নেমে এসেছে। কয়েক হাজার বছরের দাড়ি এবং তিনি কোনদিনই বোধহয় দাড়ি কামাননি। আচ্ছা আমাদের দেশের দেবতাদের কী সবার দাড়ি আছে? শিবের চুলে তেল পড়ে না বলে জটা আছে। কিন্তু দাড়ি? দেবরাজ ইন্দ্রের দেখেছি (ছবিতে) মুখটা আয়নার মতো ঝকঝক করছে। লক্ষ্মীর পাঁচালিতে দেখেছি ছবি আর কথা—'লক্ষ্মী-দেবী বামে করি বসি নারায়ণ / কহিতেছে কত কথা সুখে আলাপন।'

সেখানেও দেখেছি নারায়ণের মুখ ঝকঝকে। আমাদের দেবতারা কি মোঙ্গলদের আদি পুরুষ? হতেও পারে, কৈলাশের ভূগোল তো তাই বোধহয়। সমুদ্রদেবতার সঙ্গীরা আবার ভারতীয় দেবতাদের সঙ্গীদের মতোই। কারও চেহারা নন্দী-ভৃঙ্গীর মতো, কারও চেহারা ডাকিনী-যোগিনী, কেউ বা সার্কাসের জোকার। নেপচুনের হাতে বিশাল একটি চাবুক।

কিন্তু দেবতার মুখ আজ এত গম্ভীর কেন? রাগে যেন ফেটে পড়ছেন। তীরে নেমেই একটা পাথরে বিশাল চাবুকটা হাঁকড়ালেন।

তবে কি দেবতার পুজোয় আজ কোনও বিঘ্ন ঘটেছে? কোনও

উপচার বাদ গিয়েছে? অথবা ভোগের পরিমাণ কম হয়েছে? নেপচুনের পেট ভরেনি?

না। কোনটাই না। শেষ পর্যন্ত জানা গেল নেপচুনের কদিন যাবৎ একদম ঘুম হচ্ছে না। এমন কি সপ্তাহে একদিন—রবিবার ছুটি। সেই ছুটির দিনে একটু তাস খেলেন। চায়ের দোকানে আড্ডা দেন। তাও বাতিল।

চাবুক হাঁকড়ে সমুদ্র দেবতা চিৎকার করে উঠলেন—অবশ্যই রুশ ভাষায়—

"কে আমাকে জাগাল?"

"কারা কৃষ্ণসাগরকে উত্যক্ত করছ?"

"আর্টেকের এই চ্যাংড়াগুলো কি আমাকে একদণ্ডও শান্তি দেবে না?"

"দিন নেই—রাত নেই—সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে জ্বালাতন··· একটুও নাক ডাকাতে পারছি না······।"

নন্দী-ভৃঙ্গী আর ডাকিনী-যোগিনীরা বাচ্চাদের ভয় দেখিয়ে তাড়া করতে লাগল। আর শতাধিক ভাষায় অনুবাদ হতে থাকল সমুদ্র দেবতার শাপ-শাপান্তর।

পাঠকেরা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পেরেছেন, সবটাই হলো অভিনয়। আর্টেকে সমুদ্র-উৎসব শুরু হলো এই অভিনয় দিয়ে। আর এই অভিনয়ে অংশগ্রহণ করল—যারা সবাই পাইওনিয়ার, একমাত্র রকেট আর মোটর বোটের চালককে বাদ দিয়ে। নন্দী-ভৃঙ্গীদের কাণ্ডকারখানা দেখে হেসে গড়িয়ে পড়া হাজার হাজার ছেলেমেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের বুকে।

এই হলো আর্টেকের কিশোর জীবন। নাচে গানে হাসির কলরোলে জীবন গড়ার ডাক। গান এদের জীবনের সাথী। এরা লাইন বেঁধে খাবার ঘরে যাচ্ছে গান গাইতে গাইতে। স্নান করতে যাচ্ছে, ব্যায়াম করতে যাচ্ছে (ব্যায়াম আবার বাজনার তালে তালে)। খেলতে যাচ্ছে—এক্সকারসানে যাচ্ছে—এদের কচি কচি কণ্ঠের গান—পাইন বনের মাথা ছাড়িয়ে, সাইপ্রাসের ঝুঁটি নাড়িয়ে দিয়ে—পুশকিনের কবিতার অক্ষরগুলো ছুঁয়ে ছুঁয়ে ভালুক পাহাড়ের পাথরগুলো গলাতে গলাতে ছেঁড়া ছেঁড়া পেঁজা তুলোর মতো মেঘের ডানায় ভর করে ইথারে ইথারে ছড়িয়ে পড়ে। ওরা গানের ভাষায় বলে যে, আমাদের গান তোমাদের নিউট্রন বোমার শব্দকে ছাপিয়ে ঝংকার তোলে, আর, পৃথিবীর দুয়ার থেকে সন্ধানী মৃত্যুর পরোয়ানাকে ফিরিয়ে দেয়।

পাইওনিয়ারদের এক-একটা গ্রুপ আসে। থাকে গরমকালে ৩০ ও শীতে ৪০ দিন। আবার চলে যায় তারা কলরবে। পুরাতনদের জায়গা নিয়ে নেয় নতুন গ্রুপ। সাড়ে চার হাজার ছেলে মেয়ে একসঙ্গে থাকতে পারে। মাথাপিছু দিতে হয় গরমকালে ১২০ রুবল আর শীতকালে ১৬০ রুবল। অর্ধেক ছেলেমেয়েকে কোনও টাকাই দিতে হয় না। সব ব্যয় বহন করে সোভিয়েত সরকার। ৪৫০ জনকে পুরো টাকাটাই দিতে হয়। আর অবশিষ্ট ছেলে-মেয়েদের শতকরা ৩০ থেকে ৫০ ভাগ ছাড়। তবে এই টাকা বহন করে ট্রেড ইউনিয়ন ও অন্যান্য সংগঠনগুলো। বিদেশী কিশোররা সোভিয়েতের অতিথি। তাদের খরচার প্রশ্নই ওঠে না।

আর্টেক ক্যাম্পে যোগদান করতে পারাটা পাইওনিয়ারদের পুরস্কার। যারা পড়াশুনায় ভাল, ব্যবহারে আদর্শস্থানীয়, সাহস, উচ্চ নৈতিকতার

পরিচয় দেয় কিংবা সামাজিক কাজ, সংগঠনের কাজ ভাল ভাবে করে, তারাই অগ্রাধিকার পায়। প্রতিটি ব্রিগেডের সভাতে নিজেরাই নিজেদের ক্যাম্পের প্রতিনিধি নির্বাচন করে।

গানাজি এই সুযোগে আমাকে জানিয়ে রাখল সোভিয়েতের ১০ থেকে ১৫ বৎসর বয়সের বালক-বালিকাদের নিয়ে এই পাইওনিয়ার সংগঠন। সদস্য সংখ্যা ২ কোটি। তৈরি হয়েছে ১৯২২ সালে। সাদা শার্ট অথবা ব্লাউজ, ধূসর নীল প্যান্ট আর সেই রঙের টুপি এদের পোশাক। গলায় লাল স্কার্ফ গলা জড়িয়ে সামনের দিকে বাঁধা। শার্ট বা ব্লাউজের বাঁ হাতের উপর দিকে একটা ব্যাজ, তাতে পাইওনিয়রের প্রতীক-চিহ্ন।

এইবার আমি আবার ইতিহাসের প্রশ্নে চলে যাই। আচ্ছা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ক্রিমিয়া, আর্টেক সবই নাৎসিদের কবলে চলে গিয়েছিল। তখন তো পাইওনিয়ার ক্যাম্প বন্ধ ছিল?

গানাজি জানাল, "আর্টেক বন্ধ ছিল। কিন্তু পাইওনিয়ার ক্যাম্প বন্ধ ছিল না। সাইবেরিয়ার একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে স্থানান্তরিত হয়েছিল। ফ্যাসিস্টরা আর্টেক ক্যাম্প ধ্বংস করে দিয়েছিল। সেই ধ্বংসস্তূপের উপর নতুন আর্টেক গড়ে উঠেছে।"

জগত আসি সেথা করিছে কোলাকুলি

এতক্ষণে আমরা পৌঁছে গিয়েছি আর্টেক স্টেডিয়ামে। প্রায় দশ হাজার ছেলেমেয়ে স্টেডিয়ামে বসতে পারে। এই স্টেডিয়ামে ছেলেদের সঙ্গে এক সঙ্গে খেলাধুলা করে গিয়েছেন বিখ্যাত ওলিম্পিক গোলরক্ষক

লেভ ইয়াসিন, বরফ-হকির তিন নায়ক ভ্লাদিমির পেত্রভ, বরিস মিখায়লভ এবং ভালেরি কারলানভ। খেলাধুলা এদের ক্যাম্প জীবনের অন্যতম অঙ্গ। আর্টেক শিশু স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় শিশু ওলিম্পিক। একটা ছবি দেখলাম ইউরি গাগারিন বাচ্চাদের সঙ্গে স্লিপার খেলছেন। স্লিপার খুব মজার খেলা। দলবেঁধে ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে খেলতে পারে। মাঝখানে একটা পিচ। পিচের মধ্যে একদল ছেলে। আর একদল ছেলে দুই ভাগ করে পিচের দুই পাশে। তারা বল ছুঁড়ে মারছে ভিতরের ছেলেদের গায়ে, লাগলেই আউট। এখানে এটা খুবই জনপ্রিয় খেলা। এখানে বলে রাখা ভাল প্রতি ক্যাম্প এবং ব্লকেই পৃথক খেলাধুলার ব্যবস্থা আছে।

স্টেডিয়াম অতিক্রম করেই একটা পার্ক। এখানে কয়েকজন ছেলেমেয়ে দেখলাম গল্প করছে। ওদের সঙ্গে আমিও বসে গেলাম। ওরা খুব সাদর অভ্যর্থনা জানাল। কারও নাম লুদা, কারও নাম ওয়াসিম, ইসমাইল লেনা, তানিয়া, শ্রীসীতা, নাতাশা। সবাই পাইওনিয়ার। বিভিন্ন রিপাবলিকের। আজেরবাইজান, ইউক্রেন, জর্জিয়া, রুশ, কাজাখ প্রভৃতি ওরা একই পাইওনিয়ার গ্রুপের। ওদের বললাম তোমাদের ক্যাম্পের দু'একটা মজার ঘটনা বল তো।

ওরা উচ্ছল হয়ে উঠল, মজার ঘটনা, তা হলে শোন। দুটোই আন্তর্জাতিক মজার ঘটনা।

এখানে একটা বিষয় দেখছি এরা হাসতে পারলে আর হাসাতে পারলে আর কিছু চায় না। দু'-তিনজন রাশিয়ান এক জায়গায় থাকলেই এ ওর পিছনে লাগে, ঠাট্টা তামাশা পরিহাস লেগেই আছে। আমার দু'পাশের ঘরেই দেখি সব সময় হি-হি-হা-হা। রাস্তায় হয়ত

দু'-তিনজন একসঙ্গে যাচ্ছে হঠাৎ অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। তারপর পাঁচ মিনিট দাঁড়িয়ে হেসে নিল। আবার চলতে শুরু করল। অথচ একমাস-পনের দিন আগেও এরা কেউ কাউকে চিনত না।

কাজেই ওরা আমাকে পেয়ে হাসবার একটা চান্স পেয়ে গেল। আর গানাজি তো আছেই—দোভাষী। শুরু করল যে মেয়েটি তার নাম ওলিয়া।

আমাদের এখানে রেইমো নামে একটা ফিনল্যাণ্ডের ছেলে এসেছিল। লম্বা, একমাথা ঝাঁকড়া চুল আর কথা বলত খুব কম। একদিন ওর হঠাৎ কী হলো—দেখি একেবারেই গুম মেরে আছে। প্রথম প্রথম ওর পিছনে লাগবার চেষ্টা করলাম—দেখি ওর মন ভালো করা যায় কিনা। কিন্তু না, ভবি ভোলবার নয়। তখন আমাদের চিন্তা হলো ওর হলোটা কী?

পরদিন ব্যাপারটা বোঝা গেল। ওর দাঁতের যন্ত্রণা। ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা। মুখ ব্যথায় নীল হয়ে গেছে। সারা রাত ঘুমোয়নি। চুলগুলি খাড়া খাড়া হয়ে আছে। একদিনেই চোখের কোণে কালি পড়ে গেছে।

আমাদের গ্রুপলিডার ওকে বলল, "তোমার সোজা দাঁতের ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত এখনই"।

আমি বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"এখানে হাসপাতাল কোথায়"?

আমার প্রশ্ন শুনে সবাই হো হো করে হেসে উঠল। অনেকক্ষণ ধরে একচোট হাসল। যেন সার্কাসের জোকার কোনও মজার কথা বলছে।

উত্তর দিল গানাজি: "দাঁড়াও, তোমাকে এখানকার স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যাপারটা আগে বলে নিই। তা না হলে গল্পের রস পাবে না।

তুমি এই যে ক্যাম্পগুলি দেখছ, প্রতিটি ক্যাম্পেই চিকিৎসার আধুনিক যন্ত্রপাতি আছে। প্রতিটি শিশুকেই এখানে পূর্ণাঙ্গ পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হয়, প্রত্যেকটি শিশুর মেডিক্যাল রিপোর্ট রাখা হয়। প্রত্যেক দিন প্রতিটি শিশুর কার্যকলাপের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখা হয়। প্রতিটি শিশুর স্বাস্থ্য বিবেচনা করে সমুদ্রস্নান, বাতাসস্নান বা রৌদ্রস্নানের ব্যবস্থা করা হয়, ডাক্তাররাই এখানে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। তাঁদের অনুমোদন ছাড়া কোনও কর্মসূচীই গৃহীত হতে পারে না। ক্যাম্পের বাইরে কোনও প্রমোদভ্রমণ হলেই ডাক্তাররা সঙ্গে যান। ডাক্তাররা নিজেরা সময়সূচী নির্ধারণ করে দেন। ছেলেমেয়েরা কোনও খাবার খাচ্ছে, কি খাচ্ছে না নিজেরাই দেখাশুনা করেন। মেডিক্যাল ইউনিট ২৪ ঘণ্টাই খোলা। প্রাথমিক চিকিৎসার একটি চলমান ভ্যান সব সময়ই তৈরি হয়ে আছে।"

ছেলেমেয়েগুলি এতক্ষণ কথা বলতে না পেরে ছটফট করছিল। গানাজি একটু থামতে না থামতেই ওয়াশিম কথার সূত্র ধরে নিল। মাথার চুল একেবারেই এলোমেলো, কিন্তু চোখদুটো চক্‌চক্ করছে। মনে হলো ওই দলের নেতা।

কিন্তু রেইমো কিছুতেই দাঁতের ডাক্তারদের কাছে যেতে রাজি নয়।

আমি ওকে ধমক দিয়ে বললাম, "তার মানে তুমি এত বড় ছেলে হয়ে দাঁত তুলতে ভয় পাও"।

রেইমো ঘর ছেড়ে দৌড় লাগাল।

সব মেয়েরা ওকে তাড়া করল—আর হাততালি দিয়ে দিয়ে কোরাস গাইতে লাগল। সেই গানের মোদ্দা কথা সাদা বাংলায় দাঁড়ায়, "এ—মা এত—বড়—ছে—লে—দাঁত তুলতে ভ—য় পা—য়"। আমার

সামনেই ছেলেমেয়েগুলো সেই ঘটনার কথা মনে করে হাসতে হাসতে এ ওর গায়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল। আমার তখনও হাসি পায়নি। কিন্তু মজা বাড়িয়ে দেবার জন্য ওদের হাসিতে যোগ দিলাম।

গানাজি কি হাসিতেও দোভাষী। কিছুক্ষণ ওদের হাসি দেখে আমার দিকে তাকিয়ে হাসে। আবার কিছুক্ষণ আমার হাসির দিকে তাকিয়ে ওদের দিকে চেয়ে হাসে। ভাবখানা যেন এই আমাকে জানাচ্ছে পাইওনিয়াররা হাসছে, আবার, পাইওনিয়ারদের জানায়, দেখ, তোমাদের ভারতীয় বন্ধু হাসছে।

"শেষ পর্যন্ত প্রায় আধ ঘণ্টা ধস্তাধস্তির পর রেইমো তার সুন্দর জ্যাকেটখানা গায়ে দিয়ে দাঁতের ডাক্তারের কাছে গেল।" ওয়াসিম জানাল।

আমাদের একজন অত্যুৎসাহী বন্ধু মারিংকা পিছন পিছন গেল রেইমো দাঁত তোলার সময় কি করে দেখতে।

এতক্ষণে মারিংকা মুখ খোলার সুযোগ পেল। "জানেন তো, রেইমো চুপচাপ চেয়ারে বসে থাকল। স্ট্যাচুর মতো। নট্ নড়ন চড়ন্ নট্ কিচ্ছু। ডাক্তার তার দাঁত দেখল। সোজা টেনে বার করে নিল, রেইমো টুঁ-শব্দটি করেনি। কিন্তু কথা বলল রেইমোর দোভাষী। রেইমো যখন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল তখন দোভাষী ডেকে বলল, "এই যে রেইমো, জ্যাকেটটা তোমার। নিয়ে যাও। ভুলে যাচ্ছ কেন? এত সুন্দর জ্যাকেট।"

"না আমি ভুলিনি"—রেইমোর গম্ভীর উত্তর। দোভাষী তখন অবাক হয়ে গিয়েছে।

"এটা তো তোমারই জ্যাকেট। না-কি?"

"আমার কাছে কোনও টাকা নেই। ডেন্টিস্টের ফি দেব কী করে? তাই জ্যাকেটটা রেখে এসেছি।" ছেলেমেয়েগুলি আবার অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। আমি এবার আন্তরিকভাবেই ওদের হাসিতে যোগ দিলাম।

দু'টি দেশের একই বয়সের দু'টি শিশুর কী বিপরীত অভিজ্ঞতা। একজন জানে চিকিৎসা পয়সা দিয়ে কিনতে হয়, এটাই নিয়ম। আর একদল জানে, চিকিৎসার জন্য পয়সা দিতে হয় নাকি? ও তো আমরা বিনামূল্যেই পেয়ে থাকি। আমার কাজ তো অসুখ বাধানো। অসুখ বাধালেই আমার কাজ শেষ। তখন কাজ শুরু ডাক্তার, নার্স, পলিক্লিনিক আর হাসপাতালের।....শ্রীসীতা বলে উঠল—তা হলে আমি আমেরিকান ছেলেটার গল্প বলি।

আমেরিকান শুনেই আমি একটু নড়েচড়ে বসলাম। রাশিয়ায় বসে আমেরিকানদের কথা শুনলে একটু চনমনে ভাব জাগে। প্রতি দেশ থেকেই যেমন সোভিয়েত সরকারের অতিথি আসে, আমেরিকা থেকেও তেমনি আসে। শিশুরাও বাদ যায় না। শ্রীসীতার আর তর সইছে না। "আমার গল্পের নায়কের নাম এর উইন কুইন। ও যে আমেরিকান, তা তো আগেই বলা হয়েছে। ভীষণ চটপটে, স্মার্ট, ছটফটে। বছর পনের বয়স। দৌড়ে আমাদের গ্রুপে ফার্স্ট। সাঁতার কাটে কী, যেন সমুদ্রেই ওর জন্ম-কর্ম। এখনই ওর গ্রীক মডেলের মতো ফিগার। চোখ দুটো কী চঞ্চল······।"

শ্রীসীতা আরও কী কী বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু লুদা ওকে থামিয়ে দিল, "বোঝা যাচ্ছে তোর ফিগারের বর্ণনা আর শেষ হবে না। তুই ওর ফিগার নিয়ে কবিতা লেখ—আমি ততক্ষণে গল্পটা শেষ করে নিই।

এখনই খাবার ঘরে যাবার বিউগল বাজবে।" লুদার কথায় প্রচ্ছন্ন কৌতুকের খোঁচা গোপন থাকল না।

সবাই মুখ টিপে হাসতে শুরু করল। কিন্তু শ্রীসীতার মুখে ঘনিয়ে এল অন্ধকার। ততক্ষণে পার্কের সবুজ গালিচার উপর গাছের স্নিগ্ধ ছায়ার আস্তরণ। অস্পষ্ট আলো ছায়ায় ওর জলভরা চোখের দিকে আমি অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম। সাত সাগর আর তেরো নদীর পার থেকে আসা ক্ষণিকের অতিথির প্রাণচঞ্চল উচ্ছলতা এক কিশোরী মনের পাপড়ি মেলে দিয়ে গিয়েছে।

আমি বলে উঠলাম, না-না শ্রীসীতাই বলুক। আমার খুব ভাল লাগছে শুনতে। গল্প তো এমনি করেই বলতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে মেঘ উধাও, এক মুখ ভোরের আলো নিয়ে শ্রীসীতা আবার শুরু করল। ভাবখানা এই—গল্পের তোমরা কী বোঝ! আসল সমঝদারকে দেখে শিখে নাও।

"কিন্তু হঠাৎ একদিন এর উইন ব্যথায় ছটফট করতে শুরু করল, সঙ্গে সঙ্গে ওকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। ডাক্তাররা সন্দেহ করলেন অ্যাপেণ্ডিসাইটিস। সেই মুহূর্তেই ইয়াল্টা শহরের বড় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে ভালভাবেই তার অপারেশন হলো। কদিনের মধ্যে সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ক্যাম্পে যোগ দিল।

"দেখলাম অপারেশন করে একটু রোগা হয়েছে। কিন্তু ছটফটে ভাবটা একটুও যায়নি। আমাকে দেখেই চুলের ঝুঁটি নাড়িয়ে দিলে। আমি ওকে ভয় দেখালাম তোমার অপারেশনে ব্যথা লাগিয়ে দেব। ও পাত্তাই দিল না। শুধু চুলের ঝুঁটিটা আবার নাড়িয়ে দিল।"

"আসল গল্পে ফিরে এস শ্রীসীতা"—লুদার সতর্ক বাণী। কিন্তু ঠোঁটের কোণে দুষ্টুমির হাসিটা লেগেই আছে।

"সন্ধ্যাবেলা নাম ডাকার সময় এর উইন সকলকে অবাক করে এক বক্তৃতা দিয়ে বসল।"

"ও একটা কাগজ থেকে রাশিয়ান ভাষায় পড়তে শুরু করল। বোধহয় দোভাষীকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছিল। ও এক-একটা রুশ শব্দ উচ্চারণ করে আর আমরা মনে মনে হেসে লুটোপুটি খাই।"

"মনে মনে কেন?"

"বা! তখন রোল কল হচ্ছে না—তখন হাসি তামাশা একদম বন্‌ধ্।"

"তুমি শুধু একাই মনে মনে হাসছিলে আমরা কেউ হাসছিলাম না।" লুদা পিছনে লাগল, ফুঁসে উঠল শ্রীসীতা। একেবারে বাঙালী মেয়েদের মতো ঝগড়া করে উঠল—"ওমা কী মিথ্যুক—সেদিন সবাই এর উইনকে বলল—তোমার রুশ শুনে আমরা মনে মনে হেসে লুটোপুটি খাচ্ছিলাম। আর এখন বলে কিনা—না।"

গানাজি ঝগড়া থামালে আবার গল্প শুরু হলো—এর উইন বক্তৃতায় বলল, "আমি অ্যাপেণ্ডিসাইটিসে আক্রান্ত হয়েছিলাম। একজন সোভিয়েত শল্য চিকিৎসক আমাকে অস্ত্রোপচার করেছেন। আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। আমি খুশি যে, আমার ঘটনাটা সোভিয়েত রাশিয়াতেই ঘটল। কারণ এটা যদি আমার দেশে ঘটত, তবে আমার বাবা-মাকে অনেক—অনেক টাকা খরচ করতে হতো।"

বলতে বলতে শ্রীসীতার গলা পরিবর্তিত হয়ে গেল। কণ্ঠস্বরের

মধ্যে ফুটল গর্বের ভঙ্গি। নিজের দেশের সম্পর্কে এত প্রশংসা শুনলে কোন শিশুই না গর্ববোধ করে।

হঠাৎ পাহাড়ের কোল ঘেঁষে বেজে উঠল বিউগলের তীব্র স্বর। পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ সব দিক থেকে তীক্ষ্ণ স্বর ঝাঁপিয়ে পড়ল একসঙ্গে! পাইন আর সাইপ্রাসের বনকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়ে ভাল্লুক পাহাড় আর পুশকিন পাহাড়ের দেওয়ালে লেগে প্রতিধ্বনি তুলল—বেলা যে পড়ে এল। পাইওনিয়ার দল—চেয়ে দেখ। দিনের শেষে ঘুমের দেশের ঘোমটা পরা ঐ ছায়া।

এবার ঘরে ফেরার পালা। সচকিত পাইওনিয়াররা লাইন করে দাঁড়িয়ে গেল। ওয়াসিম সামনে। সব ছেলেমেয়ে লাইন করে দাঁড়িয়ে গিয়েছে, আর পরস্পরের পিছনে লাগা, খুনসুটি নয়। এবার গানে ভুবন ভরিয়ে ক্যাম্পে ফেরা।

তখনই আমার মনে পড়ে গেল পাইওনিয়ার ক্যাম্পে আসব বলে এক বাক্স চকোলেট নিয়ে এসেছিলাম। তাড়াতাড়ি ব্যাগ থেকে বার করে ওদের দিতে শুরু করলাম। ওরা হুড়োহুড়ি করে নিয়েই আবার লাইনে দাঁড়াতে শুরু করল। কচি কচি আঙুলের মুঠোর মধ্যে চকোলেট দিতে দিতে দেখি একটা লোমশ হৃষ্টপুষ্ট হাত উঁকি দিচ্ছে। তাকিয়েই হেসে ফেলি—গানাজি।

আমরা রচি ভালবাসার আশার ভবিষ্যৎ

পার্ক থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে গানাজি আমায় সুইমিং পুল দেখিয়ে দিল। দেখ পাইওনিয়ার ক্যাম্পে বাচ্চারা শুধু হুল্লোড় করতে

আসে না ! এটা ওদের ট্রেনিং ক্যাম্পও। এরা পরস্পর অভিজ্ঞতা বিনিময় করে, কেমন করে আরও আকর্ষক করে পাইওনিয়র গ্রুপের কাজ সংগঠিত করা যায়। স্কুলের উৎসব, সাংস্কৃতিক, খেলাধুলা প্রতিযোগিতা, ফুলের সংগ্রহ আরো নানা বিষয়। দেশের সমস্ত রিপাবলিক থেকে ছেলেমেয়েরা এখানে এসে নানা সমাবেশে অংশগ্রহণ করে। তরুণ অগ্নিনির্বাপক, সাংবাদিক, নার্স, এয়ারক্রাফটের মডেল নির্মাণকারী, নৃত্যশিল্পী, সঙ্গীতশিল্পী সবাই তাদের কলাকৌশল এখানে প্রদর্শন করে। আর্টেক শিশুরা শেখে, কেমন করে ড্রাম বাজাতে হয়, বিউগলে ফুঁ দিতে হয়, পায়ে পা মিলিয়ে হাঁটতে হয়, পাইওনিয়ার সঙ্গীতে মূর্চ্ছনা তুলতে হয়, মানচিত্র পড়তে হয়, তাঁবু খাটাতে হয়।

আর্টেকের অভিজ্ঞতা নিয়ে আমাদের দেশের সর্বত্র ছড়ানো ষাট হাজার পাইওনিয়ার ক্যাম্প তাদের কার্যকলাপ সংগঠিত করে।

"তোমাদের আরও কয়েকটা ভাল ভাল ক্যাম্পের নাম করতে পার ?" আমার প্রশ্ন।

"ককেসাসের 'ইগলেট' ওদেসার কাছে 'ইয়ং গার্ড', বাইলোরুশিয়াতে 'লিটল বিশন' বাল্টিক সাগরের উপকূলে রিগা নদীর দু' তীরে 'লাটভিয়ান আর্টেক', 'সাইবেরিয়ান আর্টেক'—আর কত নাম করব।"

তবে আর্টেক হলো শ্রেষ্ঠ ক্যাম্প, শিশুরাই হলো আমাদের ভবিষ্যৎ, আমরা ওদের প্রাণঢালা ভালবাসা দিয়ে গড়ে তুলছি।

আমি গুনগুন করে বলে উঠলাম, "আমরা রচি ভালবাসার আশার ভবিষ্যৎ"।

গানাজি বলল এটা কি গান ?

"না—এটা একটা কবিতার লাইন।"

"কার ? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ? গানাজির প্রশ্ন।"

"কেন, আমাদের কি রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কবি নেই ? তোমরা তো আর কারও নাম জান না।"

"ঠিকই। আমরা চারজন ভারতীয়ের নাম জানি, যখন তোমাদের যে প্রধানমন্ত্রী হয় তাঁর, টাগোর, রাজকাপুর আর এখন জানি রাকেশ শর্মা।

"আর একটা গুরুতর কথা তোমায় বলতে ভুলে গেছি। অনেক সময় পাইওনিয়াররা ফসল তুলতে পার্শ্ববতী গ্রামের কৃষকদের সাহায্য করে এবং বিনিময়ে কিছু উপার্জনও করে। উপার্জনের টাকা তারা আবার নতুন পাইওনিয়ার ক্যাম্প তৈরি করতে চাঁদা হিসাবে জমা দেয়।"

"কিন্তু আর নয়—এখনও ছুটি জরুরি বিষয় তোমার দেখার আছে। হাতে সময় বেশি নেই। ঐ দেখ দূরে পশ্চিমে ডুবিছে তপন গগন কোণে।"

সুন্দর বর্ণময় ফুলবাগানের মধ্য দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে গানাজি বলে চলল, "দেখ আর্টেকের চেহারা প্রতি বছরই বদলে যাচ্ছে। নতুন নতুন বিষয় যুক্ত হয়ে আর্টেক ক্রমশই বেশি সুন্দর হচ্ছে। নতুন নতুন বাড়ি উঠছে, খেলার মাঠ বাড়ছে, আরও সুইমিং পুল হচ্ছে। পরিকল্পনায় শিশুরাও খুব সাহায্য করছে। শিশুদের কল্পনাশক্তি অপরিসীম। ওরা দ্রুত কল্পনার পাখায় ভর করে উড়ে যেতে পারে। তাই আমরা পাইওনিয়ারদের একটা প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করি। প্রবন্ধের বিষয় হলো—'একবিংশ শতাব্দীতে আর্টেক কেমন হবে।' শিশুরা খুব মজার মজার অথচ খুবই চিত্তাকর্ষক পরামর্শ দিয়েছে। এই দেখ তোমাকে একটা নিদর্শন দেখাচ্ছি"।

ততক্ষণে আমরা একটা এক্‌জিবিশন হলে চলে এসেছি। এখানে ইউরি গাগারিনের প্রচেষ্টায় একটা মডেল মহাকাশ কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। স্পুতনিক থেকে শুরু করে সব মহাকাশযানের মডেল আছে। মহাকাশচারীদের ছবির মধ্যে দেখলাম রাকেশ শর্মার হাসিমুখ। পাইওনিয়াররা এখানে এসে মহাকাশযানের মডেল গড়ে। এরই একটা ঘরে কতকগুলি চিত্তাকর্ষক রচনার অংশ। আমি একটা পাইওনিয়ার গ্রুপের প্রবন্ধের অংশ বিশেষ তুলে দিচ্ছি ঃ

"আমরা আর্টেকের উদ্‌যাপনের দিনটি কল্পনা করছি। প্রত্যেক গ্রুপ সিমফার পুল থেকে বিমানে কিংবা হেলিকপ্টারে সোজা এসে নামবে তাদের জন্য নির্ধারিত ব্লকের ছাদে। ব্লকগুলি তৈরি হবে আর্টেক শব্দের প্রত্যেকটা অক্ষর সাজিয়ে। দূর থেকে বাড়িগুলি দেখলেই পড়া যাবে "আর্টেক"। উপরে ক্যাম্পের সঙ্গে মাটির নিচের একটি ক্যাম্প যুক্ত থাকবে। মাটির নিচের ক্যাম্পের সঙ্গে বিশেষ ভূগর্ভ রাস্তা দিয়ে সমুদ্রের যোগ থাকবে। সেখানে একোরিয়মের আকৃতিতে একটা সমুদ্রদেবতা নেপচুনের নামে নেপচুন ক্যাম্প থাকবে। সেখানে নেপচুনের একটি মূর্তি থাকবে। আর্টেকের একটা চন্দ্র ক্যাম্পও থাকবে। আর্টেক মহাকাশ কেন্দ্র থেকে রকেটে চড়ে সেখানে যেতে হবে। পাইওনিয়াররাই ঐ রকেট চালাবে। জলের নিচেও আর একটা ক্যাম্প থাকবে। ছেলেমেয়েরা বিভিন্ন ধরনের পোশাক পরবে। নেপচুন ক্যাম্পের ছেলেমেয়েরা পরবে হাল্কা নীল পোশাক, মাথায় থাকবে নেপচুনের মুকুট। জলের নিচে ক্যাম্পে ছেলেমেয়েরা পরবে গাঢ় নীল পোশাক, মাথায় ডাইভিং হেলমেট। চন্দ্র ক্যাম্পের থাকবে হলুদ পোশাক। সকলেই পরবে লাল স্কার্ফ। গানাজি আমায় প্রশ্ন

করল, "আর্টেক শতবর্ষের আর ৪১ বছর বাকি আছে। আজকের শিশুদের কল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করা কি একেবারেই অসম্ভব? তোমার কী মত?"

আমার দৃষ্টি তখন চলে গিয়েছে কৃষ্ণসাগরের আকাশে। হলুদ রঙের গোলাকার চতুর্দশীর চাঁদ। চাঁদের মাঝখানে দীর্ঘ ছায়া। চাঁদের মা বুড়ি চরকা কেটে চলেছে। তবে রাশিয়ায় চাঁদের মায়ের বয়স কি বেশি? আমাদের দেশের চাঁদের মা সোজা হয়ে বসে চরকা কাটে। কিন্তু রাশিয়ার চাঁদের মার মেরুদণ্ড একেবারে বেঁকে গেছে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণ তৈরি করে। তিন মাথা এক। গানাজিকে বললাম, "তবে ক্যাম্পটা করো এমনভাবে, চাঁদের মা বুড়ি আর চরকাটার গায়ে যেন আঁচড় না লাগে।"

গানাজি আবার অট্টহাস্যে পাহাড় কাঁপিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরল, "খারাশো, খারাশো, অচিন খারাশো।"

এস শান্তি, বিধাতার কন্যা ললাটিকা

এবার ফেরার পালা। উঁচু নিচু আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে আবার এসে পৌঁছলাম ৬৩টি দেশের মাটি দিয়ে গড়া আন্তর্জাতিক বন্ধুত্বের স্মারকস্তম্ভের কাছে। আর্টেকের নামই হলো শান্তি ও বন্ধুত্বের শিবির। ক্যাম্প তৈরি হবার পরের বছরই জার্মান শিশুরাই প্রথম আন্তর্জাতিক আগন্তুক। ১৯৩২ সালে বিপ্লবী আন্দোলনের তরঙ্গের ছাপ নিয়ে এল অস্ট্রিয়ার শিশুরা, চার বছর পরে এল স্পেনের শিশুরা—যাদের বাবা-মা গণতন্ত্রের পতাকা হাতে নিয়ে বীরের মৃত্যু বরণ করেছেন, অথবা কারার

অন্তরালে দিন অতিবাহিত করছেন। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে স্পেনের কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন নেতা ডলরাস ইয়াবুরি লিখলেন ঃ

"কৃষ্ণসাগরের তীরে আছে একটি ছোট্ট সুন্দর শহর। এই শহরের মানুষেরা জীবনজয়ের গান গায়। এইটাই হলো পৃথিবী বিখ্যাত শহর আর্টেক। যার মাটিতে আশ্রয় পেয়েছিল পৃথিবীর বহু দেশের শহীদ যোদ্ধা অথবা শত্রুর কারান্তরালে আবদ্ধ বিপ্লবীর সন্তানেরা। আর্টেকের গান আর প্রাণখোলা হাসি উল্লাস এই সব পিতৃ-মাতৃহীন শিশুদের কাছে নিয়ে এসেছিল আলোর ঝর্ণাধারা।"

বিদেশী শিশুরা সোভিয়েত শিশুদের সঙ্গে একসঙ্গে ক্যাম্প জীবনযাপন করে। তারাও খাবার ঘরে পরিবেশনের কাজে ভাগ নেয়। নিজেদের কাজ নিজেরা করে, সোভিয়েত শিশুদের সঙ্গে একসঙ্গে নাচে, গায়, সমুদ্রে সাঁতার কাটে, খেলাধুলা করে, বেড়াতে যায়, বিদেশী ভাষা শেখে।

প্রতিটি বিদেশী গ্রুপে থাকে তাদের বয়স্ক নেতা এবং দোভাষী। এখানে শিশুদের আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয় প্রতি বছরই। প্রতিটি দেশের প্রতিনিধিরা তাদের দেশের কিশোর সংগঠনের রিপোর্ট দেয়।

সমস্ত শিশুরাই আন্তর্জাতিক উৎসব এবং সংহতি সভায় যোগ দেয়। আর্টেকের বন্ধুত্বের পার্কে একশতটি দেশের শিশুরা বৃক্ষ রোপণ করেছে। প্রথম বৃক্ষটি রোপণ করবার দুর্লভ সম্মান অর্জন করেছে ভিয়েতনামের শিশুরা।

শান্তি ও সংহতি দিবস এখানে খুবই বৈচিত্র্যময়। ঐদিন ফুটপাতে ওদের ছবি আঁকার প্রতিযোগিতা হয়। শিশুরা চলে যায় কিন্তু ছবিগুলি ফুটপাতে জীবন্ত থাকে—বন্ধুত্বের প্রতীক হিসাবে।

শান্তি দিবস বৈচিত্র্য আনে বিভিন্ন দেশের শিশুদের শান্তি কামনা আর যুদ্ধের বিরুদ্ধে সম্মিলিত তীব্র ঘৃণায়। একজন পাইওনিয়ারের জবানিতে এবারে শান্তিদিবসের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়ে আমার বর্তমান ভ্রমণকাহিনী শেষ করব।

"আজ শান্তিদিবস। সকালেই আমাদের ঘুম ভাঙল বিউগলের আওয়াজে—ভোর ভয়ি ভোর ভয়ি। ওঠো শিশু মুখ ধোও পর নিজ বেশ। কাঁচের জানালার মধ্য দিয়ে বিছানায় লুটোপুটি খাচ্ছে একমুঠো রোদ্দুর। বালুকা বেলায় উষসী আলো পরম স্নেহে চিকন সোনা এঁকে দিয়েছে।

আমাদের ক্লাবঘরে সাজানো আছে সারি সারি লাল, সাদা, সবুজ, হাল্কা নীল নানা রঙ-বেরঙ-এর বিভিন্ন দেশের পাইওনিয়ারদের স্কার্ফ। এই স্কার্ফগুলি মিলিয়ে হবে বিশাল এক পতাকা। কাম্পের শীর্ষে সাগরের হাওয়া গায়ে মেখে উড়বে আমাদের বর্ণময় বন্ধুত্বের পতাকা।

সকাল শেষ হতে চলল। চারিদিক থেকে শুধু গানের ঐকতান বিভিন্ন ভাষায়। প্রতিটি দেশের শিশুরা তাদের জাতীয় খেলাধুলার প্রদর্শনী দেখাল। নাচল অবিশ্রান্ত। তারপর ভিয়েতনামের মেয়েরা একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে সূর্যকিরণ থেকে ক্যাম্প ফায়ারের আগুন জ্বালালো।

"বিকেলে সেই বিখ্যাত শান্তি আবেদনের কর্মসূচী। আগের দিনই চিঠির বয়ান রচনা করা হয়েছিল। শান্তির আবেদন চিঠির আকারে। বিভিন্ন দেশের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে বোতলে ভরে সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দিয়ে।

"৬৩টি দেশের শিশুরা ৩টি ভাষায় লেখা চিঠি ভরা বোতল নিয়ে জাহাজে উঠল। জাহাজ যাবে সমুদ্রের অভ্যন্তরে রাশিয়ার সীমারেখা পার হয়ে আন্তর্জাতিক সমুদ্রের সীমানার অভ্যন্তরে। সেখানেই আমাদের কর্মসূচী।"

মন্দ মন্থরে সন্ধ্যা নামল আর্টেকের বুকে। অন্ধকার বনচ্ছায়ে অস্ত গেল সন্ধ্যাসূর্য। ডানায় রৌদ্রের গন্ধ মেখে উড়ে গেল সীগাল। দূরদিগন্ত যেন কোনও অবগুণ্ঠনে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে, আর্টেককে পিছনে ফেলে যাত্রা শুরু করল জাহাজ।

জাহাজে ওরা গান গাইছে। যুদ্ধের বিরুদ্ধে গান। আমরা আর হিরোসিমা চাই না। চাই না বিকলাঙ্গ পৃথিবী। আমরা চাই ফুসফুস-ভরা তাজা বাতাস। শতাব্দী-লাঞ্ছিত আর্তের কান্নার শব্দ ছাপিয়ে উঠুক আমাদের গানের মহামন্ত্রধ্বনি—এ দ্যুলোক মধুময়—মধুময় পৃথিবীর ধূলি।

ধীরে ধীরে জাহাজ এসে পৌঁছল আন্তর্জাতিক সীমারেখায়। হাতে হাতে মালা গেঁথে ৬৩টি দেশের ছেলেমেয়েরা জাহাজের ডেকে দাঁড়াল। আকাশে তখন অগণ্য তারার আলো। নীলাম্বরী শাড়িতে জড়ানো সাগরের কপালে উজ্জ্বল টিপের মতো জ্বলছে চাঁদ। গলে যাওয়া রুপোর মতো উজ্জ্বল আলোর বৃত্ত রচনা করছে সাগরের বুক ফালা ফালা করে দিয়ে। বোতলের চিঠিগুলি সেই আলোর বৃত্তে আলতো করে ভাসিয়ে দিল ওরা। ওদের আর্তি, ওদের আকুতি আর ওদের মনের মাধুরী মেশানো চিঠি। ওরা জানে শান্তির ললিতবাণী এখন আর ব্যর্থ পরিহাসের

মতো শোনাবে না। দুনিয়া জোড়া মানুষের সংগ্রাম আর সমাজতান্ত্রিক দেশের উত্তুঙ্গ সামরিক শক্তি নাগিনীর বিষাক্ত নিঃশ্বাসকে টুঁটি টিপে ধরে রাখতে সক্ষম।

বোতলভরা আবেদন ভেসে চলে ঢেউ-এর দোলায়। দূরে—বহু দূরে—বহ্নি-বন্যা তরঙ্গের বেগে মেঘ-চুম্বিত কোনও অস্ত গিরির চরণ ছুঁয়ে। হয়তো কোনও দূর সাগরের পারে বাঁধভাঙা যৌবনের উল্লাসে মুখর তরুণ-তরুণীর দল সাগর ছেঁচে জীবনের মুক্তো আনতে গিয়ে পাবে এই আবেদন। বিগত যুদ্ধে সন্তান হারানোর দুঃসহ স্মৃতি বুকে তুষের আগুনের মতো জ্বালিয়ে রাখা আজকের বৃদ্ধা মায়ের মন নিংড়ে নেওয়া আশীর্বাদ কুড়িয়ে চিঠিগুলি পিকাশোর প্রতিধ্বনি তুলবে—তোমার নিউট্রন বোমা থেকে এই দেখ আমার শক্তি কত বেশি। লাঙলচষা ভুঁইতে মাটির বুক চিরে উদ্যত অঙ্কুরের মতো দুরন্ত কলরব তুলে শিশুদের আবেদন তোমার যুদ্ধের গর্জনকে স্তিমিত করে দেয়।

আমি পাইওনিয়ার ক্যাম্প থেকে শান্তি চিঠির একটা ইংরেজি অনুলিপি সংগ্রহ করেছি। অনুলিপিটি এই—

"May there always be sunshine,
May there always be blue skies,
May there always be Mummy,
May there always be me !

"We want to be friends with children all over the world.

"Grown-ups ! Make sure that the to-day and to-morrow of all children are cloudless and bright. Do everything so that there is no war on earth !

"May all children be friends as we are at Artek !

"May our planet say when it wakes up every morning !

"Hello Sun !
"Hello friend !
"Hello peaceful world !"

(শান্তি চিঠির ইংরেজি অনুলিপির বাংলা ভাবানুবাদ আমার ভাষায়)

'এ মাটির বুকে সূর্যকিরণ ভাস্বর হয়ে যাক্
নীল নীলিমায় আকাশের রঙ অম্লান হয়ে থাক।
পৃথিবীর সব গৃহকোণে থাক মায়েদের মুখে হাসি ;
মায়েদের সাথে চিরজীবী হতে আমরা যে ভালবাসি'।

এই পৃথিবীর সকল শিশুই আমাদের বোন-ভাই
শোন আজ তারা আছ বড় যারা আমরা শান্তি চাই।
ঝড়ের খেয়ায় সকল শিশুর আজ ও আগামী কাল
সাগর মাতাল উথাল পাতাল কল্‌জেতে রাখ হাল।

মেঘলেশহীন নিঃসীম নীল আকাশে শান্তি আঁকি
সারা বিশ্বের ভাই বোনদের আমরা পাঠাই রাখী।

দিগন্ত জোড়া রূপালী আলোয় রামধনু আঁকা পথে
ভালবাসাগুলো ডানা মেলে ওড়ে শান্তি-কপোত রথে।

দেশবিদেশের ভাইবোন যত তোমাদের হাত তোলো,
হাতে হাতে আজ মালা গেঁথে সবে সূর্যতোরণ খোল।
অন্ধকারকে ছিঁড়ে নিতে নিতে এ গ্রহ ছাড়ুক হাঁক—
ভয়াল ভীষণ কালো দুশমন যুদ্ধ নিপাত যাক।

চিঠিটির এই বাংলা অনুবাদ আমি আর্টেকের শিশুদের কাছে পাঠিয়েছি। বর্তমান শিশু ও ভবিষ্যতের যে শিশুরা আর্টেকে আসবে তাদের সকলের কাছে। তাদের আমি বলেছি ভারতের সত্তর কোটি মানুষের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা আজ তোমাদের সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছে। আমার ভাষা বাংলা। এ ভাষায় যাদুমন্ত্রের ছোঁয়া দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের দরবারে একে পৌঁছে দিয়েছেন। ভারতের সত্তর কোটি মানুষের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে আবেদন—এই ভাষায় লেখা চিঠি তোমাদের অসংখ্য চিঠির সঙ্গে স্থান দিও। সাগরের জলে এই ভাষার আবেদনও ভাসতে ভাসতে চলে যাক বিশ্বের প্রতিটি মানুষের দুয়ারে, যুদ্ধের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম, শান্তির জন্য আমাদের সংগ্রাম, শিশু শিশু কুঁড়িদের ফোটবার সংগ্রাম আমাদের ভাষাতেও মানুষের স্পন্দমান লাল হৃৎপিণ্ডে জোয়ার আনুক।

আমার এই অনুবাদ আর্টেকের আন্তর্জাতিক বন্ধুত্বের প্রদর্শনীর ঘরে সযত্নে রেখে দেওয়া আছে।

আমি আর্টেকের শিশুদের কাছে আরও জানিয়ে এসেছি, যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আমাদের দেশের শিশুরাও পিছিয়ে নেই। বড়দের

পায়ের চিহ্নে পা রেখে আমাদের শিশুরাও শান্তির সংগ্রামে পদক্ষেপের ছন্দ রচনা করছে। তারা জানে রক্তমাখা অস্ত্র হাতে রক্তআঁখি যুদ্ধদানব শেষ পর্যন্ত শিশু পাঠ্য কাহিনীতেই মুখ ঢেকে থাকে। আমাদের কবির ভাষাতেই তারা বলে এসো শান্তি, বিধাতার কন্যা ললাটিকা, নিশাচর পিশাচের রক্ত দীপশিখা করিয়া লজ্জিত। আজ সকল দেশের সকল ভাষায় সকল শিশুর মিলিত ঐকতান বজ্রের মতো কানে তালা লাগিয়ে জয় করে আনবে নতুন পৃথিবী, অজস্র সুখ আর সীমাহীন ভালবাসা।